ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১৬৩-১৮৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4112

ডাকাতিয়া পাড়ের মুক্তিযুদ্ধঃ রণনীতি ও রণকৌশল

মিঠুন কুমার সাহা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Pathan Bahini, a locally organized freedom fighter group based in Hajiganj area of Chandpur sub-division during the Liberation War of Bangladesh, played a role as the main force of the liberation war in the Dakatiya river area. This local fighter group transformed the liberation war into a people's war by utilizing the people's psyche who were offended by the massacre and oppression of the Pakistani forces in that area. Despite being unequal in strength, Pathan Bahini attacked the Pakistani forces initially using guerrilla war tactics. As the days passed, these forces capacitated themselves with innovative strategies and tactics, capitalizing on the geographical advantage of the Dakatiya coastal area. Guerrilla tactics followed by the Pathan forces are similar in many respects to the tactics devised by Mao Tse-tung, but some differences are also noticeable in this regard. On the whole, a blended war strategy of the freedom fighter group and local support to them became instrumental to their success against the mighty occupation army.

Key Words: Dakatiya River, People's War, Guerrilla War, Strategic Counter Offensive, Mobile Warfare.

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করলে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রতিরোধ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্য-জনতা কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনাসহ বেশ কয়েকটি স্থানে সাফল্য অর্জন করে। নরসিংদী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-নোয়াখালী, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে বাঙালি সৈন্য-জনতার শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যদল।[১] এসব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ছিল মূলত অসংগঠিত, অপরিকল্পিত, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সমন্বয়হীন অথচ স্বতঃস্ফূর্ত। এ ধরনের প্রতিরোধ মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত চলে। ভারতে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত মুক্তিবাহিনী প্রধানত দেশের সীমান্ত এলাকায় এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তিকে মোকাবেলা করে। অবরুদ্ধ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে এপ্রিল থেকেই চলেছিল সর্বাত্মক প্রতিরোধযুদ্ধ। বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থনের বাইরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল বেশকিছু স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা দল। এসব মুক্তিযোদ্ধা দল বা বাহিনী গড়ে উঠেছিল স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষাবধি তারা অবরুদ্ধ দেশে অবস্থান করেই শত্রুসৈন্য ও তাদের সহযোগী রাজাকার,

আল-বদর, আল-শামসকে মোকাবেলা করেছিল। এর পাশাপাশি জনগণের মনোবল অটুট রেখে, স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে, বাংলাদেশ সরকারের অধীন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানসহ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করতে এসব বাহিনী খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীর তীরবর্তী হাজীগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনুরূপ একটি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা দলকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। পাঠান বাহিনী নামে পরিচিত এই মুক্তিযোদ্ধা দল ডাকাতিয়া পাড়ের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট, এ দলের সাংগঠনিক বিন্যাস ও জনসংশ্লিষ্টতা, রণনীতি, রণকৌশল ও কয়েকটি রণক্ষেত্রে এই দলের ভূমিকা অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত আকর সূত্রের (Primary Sources) মধ্যে রয়েছে আত্মকথা, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, সরকারি দলিলপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে আকর সূত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রায়শ 'অসম্পূর্ণ' ছিল। এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের জন্য প্রবন্ধটিতে মাধ্যমিক উৎসসমূহও (Secondary Sources) প্রায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্লেষণ ও বর্ণনাধর্মী গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত:

(১) তাত্ত্বিক কাঠামো ও স্থানিক পরিচয়;
(২) পাঠান বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট এবং সাংগঠনিক বিন্যাস; ও
(৩) রণনীতি, রণকৌশল এবং যুদ্ধসমূহ।

(১) তাত্ত্বিক কাঠামো

একটি সমাজে কখন বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ আন্দোলন সংঘটিত হয়, সে বিষয়ে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী টেড রবার্ট গার একটি তত্ত্ব কাঠামো দিয়েছেন। এই কাঠামোর মূল বক্তব্য হলো, দুই ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমাজে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে। প্রথমত, বাইরের কোনো শোষণকারী শক্তির নীতি ও কর্মকাণ্ডের ফলে শোষিত সমাজের মৌল সংস্কৃতির উপাদানসমূহের ওপর অভিঘাত এলে সেখানে প্রচণ্ড রকমের সমষ্টিগত প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে। একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব যে সকল উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল সেই উপাদানসমূহকে মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ওপর অভিঘাত আসলে সেক্ষেত্রেও প্রতিরোধ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ হবে তা খুব তীব্র বা তুলনামূলকভাবে খুব ব্যাপক হবে না, বা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে গোটা জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে আলোড়িত করে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে না। প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত সেই বৈশিষ্ট্যগুলো, যেগুলোর প্রকৃতি শোষণমূলক প্রক্রিয়ার কারণে বিকৃত হলে একটি জনগোষ্ঠীর চেতনালোক বিক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সৃষ্টিতে আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation) একটি অভিন্ন উপাদান হিসেবে সক্রিয় থাকে। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত

জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে। যখন গণমানসে সাংস্কৃতিক উপাদানভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয় এবং তা যদি ক্রমেই বেড়ে চলে তাহলে আপেক্ষিক বঞ্চনার সৃষ্টি হয়।[২]

মৌল সংস্কৃতির উপাদানসমূহের অভিঘাতে সৃষ্ট সমষ্টিগত প্রতিরোধ গতি সঞ্চার করে সশস্ত্র রূপ লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিরোধকারী শক্তি দুর্বল হলে তারা অপ্রথাগত যুদ্ধপদ্ধতি তথা গেরিলা যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে থাকে। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব গেরিলা ওয়ারফেয়ার* এর মতে, গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি হলো প্রতিরোধকারী সংখ্যালঘিষ্ঠ বা তুলনামূলক দুর্বল পক্ষ কর্তৃক অনুসৃত এমন কিছু সামরিক কৌশল যা ঐ পক্ষ তার নিজ দেশের সরকার বা বিদেশি দখলদার শক্তিকে মোকাবেলার জন্য ব্যবহার করে।[৩] সমর তাত্ত্বিক কার্ল ফন ক্লজেভিৎসের বক্তব্য হলো, "War is nothing but a continuation of politics with the admixture of other means."[৪] গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশি সত্য। গেরিলা যুদ্ধের প্রকারগুলোর মধ্যে অন্যতম বৈপ্লবিক গেরিলা যুদ্ধ বা জনযুদ্ধের ধারণায় রাজনীতি অত্যাবশ্যক উপাদান। জনযুদ্ধের যোদ্ধাদেরকে আবশ্যিকভাবে রাজনীতি সচেতন হতে হয়। চৈনিক জনযুদ্ধ তাত্ত্বিক মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন,

> ...unless they are imbued with a progressive political spirit, and unless such a spirit is fostered through progressive political work, it will be... impossible to arouse their enthusiasm for the War of Resistance to the full, and impossible to provide a sound basis for the most effective use of all our technical equipment and tactics.[৫]

যে কোনো যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তির সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ উৎস হলো জনসমর্থন প্রাপ্তি। আর এর জন্য জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে অবশ্যই প্রতিরোধ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে হবে। প্রত্যেক প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং সাধারণ নাগরিককে বোঝাতে হবে যে, কেন যুদ্ধটি তার ব্যক্তি স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয়। এভাবে যুদ্ধে জনতাকে যত বেশি যুক্ত করা যাবে, যুদ্ধ জয় তত সহজ হবে। এ বিষয়ে মাও এর বক্তব্য, "The mobilization of the common people throughout the country will create a vast sea in which to drown the enemy, create the conditions that will make up for our inferiority in arms and other things, and create prerequisites for overcoming every difficulty in the war."[৬] এ বক্তব্য সমীচীন হবে যে, সব গেরিলা যুদ্ধই জনযুদ্ধ নয়। একটি যুদ্ধ তখনই জনযুদ্ধ হয়ে ওঠে, যখন কোনো প্রতিরোধ যুদ্ধ অকুস্থলে বসবাসরত জনসমষ্টির সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন লাভ করে, সে জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ যুদ্ধকে নিজের যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে এর জন্য এমনকি তার জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করে না।

মাও সে-তুঙ প্রণীত জনযুদ্ধনীতি চীনে অনুসৃত হয়েছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয়তাবাদী কুমিনটাঙ সরকার পরিচালিত 'কমিউনিস্ট নিশ্চিহ্নকরণ অভিযান' (১৯২৬-

৪৯) মোকাবেলা করার জন্য। চৈনিক কমিউনিস্ট গেরিলা যোদ্ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই নীতি দখলদার জাপানকে মোকাবেলায় ব্যবহার করেছিল। মাও প্রণীত এই যুদ্ধনীতি বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই চীনের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই যুদ্ধনীতি ব্যবহার করে প্রায় আড়াই দশক ধরে দুটি ভিন্ন দখলদার শক্তির (ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র) বিরুদ্ধে ভিয়েতনামিদের যুদ্ধ তো জনযুদ্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গেরিলা যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন লেখক সান যু'র মতে, জয়ী হওয়ার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো নেতার নৈতিক প্রভাব। সান *The Art of War* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, By moral influence I mean that which causes the people to be in harmony with their leaders, so that they will accompany them in life and unto death without fear of mortal peril."[৭] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো শত্রুর যুদ্ধকৌশলকে আক্রমণ করে তা ভন্ডুল করা। অর্থাৎ, নেতৃত্বের নৈতিক প্রভাবে জনসমর্থন অর্জন ও শত্রুপক্ষের যুদ্ধকৌশলকে অকার্যকর করে শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়া সম্ভব হলে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।

চীনের কুমিনটাঙ ও জাপানি দখলদার শক্তিকে পরাজিত করতে মাও সে-তুঙ জনযুদ্ধের ধারণার পাশাপাশি ঐতিহ্যিক গেরিলা যুদ্ধকৌশলেও নতুন কিছু উপাদান যুক্ত করেছিলেন। বহুল পরিচিত 'হিট অ্যান্ড রান' গেরিলা কৌশলের সাথে 'মোবাইল ওয়ারফেয়ার', 'স্ট্রাটেজিক রিট্রিট', 'ওয়ার অব কুইক ডিসিশন', 'ওয়ার অব এ্যানিহিলেশন' ইত্যাদি উদ্ভাবনী বা অপ্রচলিত যুদ্ধ কৌশল যুক্ত করে তিনি গেরিলা যুদ্ধের নতুন কাঠামো হাজির করেছেন। তিনি গেরিলা যোদ্ধা ও জনতার মেলবন্ধন ঘটাতে রাজনৈতিক প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করার তাগিদ প্রদান করেছেন। যুদ্ধটিকে শহর থেকে সরিয়ে যতটা সম্ভব প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সুবিধাজনক অবস্থানে তথা গ্রামাঞ্চলে নিয়ে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার যুদ্ধকৌশল বাতলে দিয়েছেন।[৮] এই নীতি প্রায় হুবহু অনুসরণ করে ভিয়েতনামেও বিদেশি শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল।[৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বড় ক্যানভাসের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ হলো ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী এলাকা। বর্তমান গবেষণায় টেড রবার্ট গারের বিদ্রোহ তত্ত্ব এবং মাও সে-তুঙ প্রণীত জনযুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ তত্ত্বের আলোকে ডাকাতিয়া পাড় ও তৎসংলগ্ন এলাকার মুক্তিযুদ্ধকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্থানিক পরিচিতি

মেঘনার একটি উপনদী ডাকাতিয়া। ভারতের ত্রিপুরার রঘুনন্দন পাহাড়ে জন্ম নিয়ে এটি কুমিল্লা সদর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাস্থ মিয়াবাজার

হয়ে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী দিয়ে ডাকাতিয়া লাকসামে পৌঁছেছে। এরপর পূর্ব-পশ্চিম মুখে চাঁদপুরভুক্ত শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ হয়ে চাঁদপুর সদরে ডাকাতিয়া নদী মেঘনা নদীতে মিলিত হয়েছে।[১০] মেঘনা ব্যতীত এ নদী উত্তরে গোমতী এবং দক্ষিণে ফেনী নদীর সাথে যুক্ত। এছাড়া, ডাকাতিয়া নদীর একটি শাখা দক্ষিণমুখে নোয়াখালী খাল নামে প্রবহমান। ডাকাতিয়া নামেই এ নদীর কয়েকটি শাখা শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জের ভেতর দিয়ে তৎকালীন নোয়াখালীর চাটখিল, রামগঞ্জ ও রায়পুরে পৌঁছেছে। প্রবাহপথে এই নদী অসংখ্য খাল-বিলের সাথে জালের মতো জড়িয়ে আছে। বর্তমান গবেষণায় ডাকাতিয়া পাড় বলতে প্রধানত ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী ও এর নিম্নপ্রবাহে অবস্থিত বর্তমান চাঁদপুর জেলা তথা তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমাভুক্ত হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ, নোয়াখালীর রামগঞ্জ-চাটখিল-লক্ষ্মীপুরের কিয়দংশকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত এলাকায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক তৎপরতা এ প্রবন্ধের মূল বিষয়।[১১] চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ মহকুমাকে কেন্দ্র করে উপর্যুক্ত এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে একটি মুক্তিবাহিনী সক্রিয় ছিল। এই বাহিনীর প্রধান সামরিক নেতা ছিলেন জহিরুল হক পাঠান। তার নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীটি তার নামের শেষাংশ নিয়ে 'পাঠান বাহিনী' হিসেবে পরিচিতি পায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই পাঠান বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধকেই ডাকাতিয়া পাড়ের মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংগঠক পরিচিতি

মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠান বর্তমান হাজীগঞ্জ থানাধীন অলিপুর গ্রামের মরহুম আবদুল গণি পাঠান এবং মরহুমা তাহেরুন নেছার সন্তান। তিনি ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। একজন বক্সার হিসেবেও তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[১২] মুক্তিযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি সুবেদার হিসেবে যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে লাহোরের খেমখেরান ফ্রন্টে যুদ্ধ করে তিনি বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'তমঘা-ই-জুরাত' উপাধি লাভ করেছিলেন।

পাঠান বাহিনীর অন্যতম সংগঠক ও সমর কুশলী ছিলেন কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া। হাজীগঞ্জ থানার কাসিমাবাকের রামচন্দ্রপুর গ্রামের হায়দার আলী ভূঁইয়ার পুত্র ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ (বিএম কলিমউল্লাহ) ঢাকার জগন্নাথ কলেজ হতে বি.কম. পাস করে বামপন্থি রাজনীতিতে যোগ দেন।[১৩] ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে তিনি কুমিল্লা জেলার ভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দেন। প্রগতিশীল এই ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই তিনি হাজীগঞ্জের স্থানীয়দের সহযোগিতায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন। তাকে সহযোগিতা করেন মতলব নিবাসী সুবেদার আব্দুল হক, হারেস, অলিপুরের নায়েক সুবেদার আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারি প্রমুখ। ২৬ মার্চ চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তিনি এর সদস্য হন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী চাঁদপুরের নিয়ন্ত্রণ

নেওয়ার পর হাজীগঞ্জে পাঠান বাহিনী গঠিত হয় এবং তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সংগঠক। তার নেতৃত্বে ও প্রণোদনায় পাঠান বাহিনী গড়ে উঠলেও তিনি সামরিক নেতা হিসেবে জহিরুল হক পাঠানকে মেনে চলতেন। এ দু'জনের জুটি ছিল পাঠান বাহিনীর মূল ভিত্তি।[১৪]

(২) মুক্তিবাহিনী গঠনের রাজনৈতিক পটভূমি

পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ১৯৭০ সালে চাঁদপুর থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী ও নওজোয়ান ওয়ালিউল্লাহ জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে এবং আব্দুল করিম পাটোয়ারী, এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট আবু জাফর মাঈন উদ্দিন, ডা. আব্দুস সাত্তার, রাজা মিঞা, এ্যাডভোকেট আব্দুল আওয়াল প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৫] নির্বাচন পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে জটিল ও অনিশ্চিত হয়। এসময় সচেতন বাঙালি মাত্রই অস্থিরতা ও আশঙ্কায় দিন যাপন করতে থাকেন। চাঁদপুর ঢাকা থেকে নিকটবর্তী হওয়ায় রাজধানীর রাজনীতির গতি-প্রকৃতি দ্রুত জানা যাচ্ছিল। এই আশঙ্কাও ছিল যে, পাকিস্তানি সামরিক সরকারের কোনো ধরনের সামরিক উদ্যোগ (শক্তি প্রয়োগের)-এ চাঁদপুর অতি দ্রুতই আক্রান্ত হবে। সে বিবেচনা থেকেই চাঁদপুরের বিভিন্ন স্থানে গোপন বা প্রকাশ্যে প্রতিরোধ তৎপরতা শুরু হয়েছিল। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানায় ন্যাপ নেতা কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ ও দল গঠন করার চেষ্টা চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পূর্বে হাজীগঞ্জ থানায় 'হাজীগঞ্জ সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। তোফাজ্জল হায়দার (নসু) চৌধুরী, আব্দুল মতিন বাচ্চু (পরে হাজীগঞ্জ থানার রাজাকার কমান্ডার) সহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা সম্ভবত ১৩ জন ছিল। পরবর্তীকালে যোগ দেন মতলব নিবাসী ফ্লাইট সার্জেন্ট সিদ্দিক সরকারসহ আরো কয়েকজন। থানা কমিটির সদস্যসহ প্রায় ৬০ জনের একটি দল মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিতে থাকেন।[১৬] এই দলের প্রশিক্ষক ছিলেন মতলবের সুবেদার আব্দুল হক ও হারেস, অলিপুরের নায়েক সুবেদার আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী প্রমুখ।

১৯৬৯ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শাখা হিসেবে চাঁদপুর মহকুমা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ভাসানী ন্যাপের নেতৃবৃন্দের তৎপরতায় চাঁদপুরের নতুন বাজার বালির মাঠে কাঠের ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছিল। পরিষদ আহ্বায়ক রবিউল আওয়াল কিরণ, আব্দুল মোমেন খান মাখন, আবু তাহের দুলালসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীবৃন্দ চাঁদপুর আনসার ক্লাবকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করতে থাকেন। এসময় ছাত্রগণ বিভিন্ন সরকারি গাড়িতে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিল। এর পাশাপাশি চলছিল ইতোমধ্যে সংগৃহীত হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা চালানোর সংবাদে মার্চের শেষেই চাঁদপুর আনসার ক্লাবে 'চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় । এর প্রথম সভাপতি ছিলেন আব্দুর রব (হাজীগঞ্জ)। তিনি ভারতে চলে গেলে আব্দুল করিম পাটোয়ারী (এমপিএ) সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিষদের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম (এমপিএ)। তিনিও ভারতে চলে গেলে এ্যাডভোকেট আবু জাফর মাঈন উদ্দিন (এমপিএ) সে দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়া পরিষদের সংগঠক ও অন্যান্য ভূমিকায় মিজানুর রহমান চৌধুরী (এমএনএ ও কেন্দ্রীয় নেতা, আওয়ামী লীগ), ডা. আব্দুস সাত্তার (এমপিএ), ন্যাপ নেতা কমরেড কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, নসু চৌধুরী, নওজোয়ান ওয়ালিউল্লাহ (এমএনএ), রাজা মিঞা (এমপিএ), এ্যাডভোকেট আব্দুল আওয়াল (এমপিএ), আব্দুল মান্নান, ফ্লাইট সার্জেন্ট সিদ্দিক সরকার, জীবন কানাই চক্রবর্তীসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সক্রিয় ছিলেন।[১৭] সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচেষ্টায় ঢাকা ও অন্যান্য এলাকা থেকে আগত ভীত, পলায়নপর অসহায় মানুষের জন্য খাদ্য-বস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়।[১৮] পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৮ এপ্রিল চাঁদপুর দখল করে নিলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।[১৯]

চাঁদপুরে অবস্থানরত প্রাক্তন ও বর্তমান এবং ছুটিতে থাকা বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স, পুলিশ, আনসার সদস্যসহ বেসামরিক (মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ইচ্ছুক ও উপযুক্ত ছাত্র-যুবক ও অন্যান্য পেশার লোকজন) সদস্যের সমন্বয়ে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী গঠন করেছিল। সুবেদার জহিরুল হক পাঠানকে (যিনি তখন ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন) বাহিনীর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ।[২০] কিন্তু পাঠান সাহেব সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য, "আমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে দেখি সেখানে কোনো শৃঙ্খলা নেই। ছাত্ররা সব মেজর, ক্যাপ্টেন, এরিয়া কমান্ডার হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র নিয়ে টহল দিচ্ছে... আমি করিম পাটোয়ারীকে বললাম- অসম্ভব, এদের কন্ট্রোল করা আমার পক্ষে সম্ভব না... আমি হাজীগঞ্জে চলে আসি।"[২১] এভাবেই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংগ্রাম পরিষদের সমন্বিত প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে।

চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিরোধ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ে গেলে সংগ্রাম পরিষদের কিছু সদস্য হাজীগঞ্জে ফিরে এসে পুনরায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়া হাই স্কুলকে কেন্দ্র করে একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। করিম পাটোয়ারী প্রশাসন বিভাগ, আবু জাফর মাঈন উদ্দিন অর্থ বিভাগ, কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং ডি এন হাই স্কুলের শিক্ষক জীবন কানাই চক্রবর্তী কমিটির সচিবের দায়িত্ব পান।[২২] এই কমিটির অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আলী আহম্মদ, আবুল খায়ের, সালে আহম্মদ বিএসসি, আলী আজম মজুমদার, নসু

চৌধুরীসহ প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[২৩] এই কমিটির প্রচেষ্টায় শতাধিক সামরিক ও আধা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা (যারা বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার এর সদস্য ছিলেন) পাইকপাড়া স্কুলে সমবেত হন।[২৪] এই দলকে নেতৃত্ব দিতে বেসামরিক প্রশাসনের করিম পাটোয়ারী, আবু জাফর মাঈন উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম পুনরায় সুবেদার জহিরুল হক পাঠানকে আহ্বান জানান।[২৫] সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই তিনি পাইকপাড়ায় উপস্থিত হন এবং সামরিক কাঠামো অনুসরণ করে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। এপ্রিলের মধ্য ভাগ হতে যুদ্ধের শেষাবধি এই বাহিনীর প্রধান সামরিক পরিচালক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

সাংগঠনিক বিন্যাস

পাঠান বাহিনী স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বেসামরিক প্রশাসনের অধীন থেকেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। বেসামরিক প্রশাসনের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া পাঠান সাহেবের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দু'জন আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করেছেন করণীয়। কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট, মানুষজন চিনতেন এবং প্রায় সব জায়গায় তার দল (ন্যাপ)-এর লোকজন ছিল। পাঠান বাহিনী গঠন পর্যায়ে নিউক্লিয়াস ছিল কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন ষাট জন এবং সংগ্রাম কমিটির সংগৃহীত শতাধিক প্রশিক্ষিত সেনা। মুক্তিবাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সামরিক-বেসামরিক নেতৃত্বের মধ্যে নিবিড় বোঝাপড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুবেদার জহিরুল হক পাঠান বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি নিম্নোক্ত শর্ত আরোপ করেন:[২৬]

ক) সিভিল প্রশাসন খাদ্য সংগ্রহ করবে এবং খাদ্য এক জায়গা থেকেই সরবরাহ করা হবে।

খ) খাদ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে প্রাথমিকভাবে সরকারি খাদ্য ভাণ্ডারগুলো বেসামরিক প্রশাসনের আয়ত্তে আনতে হবে। খাদ্য সংগ্রহে ডিফেন্সের প্রয়োজন হলে মুক্তিযোদ্ধারা সাহায্য করবে।

গ) মুক্তিযুদ্ধ বা গেরিলা আক্রমণ সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী হবে।

ঘ) সংগৃহীত খাদ্য ও অর্থ সংগ্রাম কমিটি বা বেসামরিক প্রশাসনের কাছে থাকবে।

ঙ) একটি নির্দিষ্ট অংকে প্রতি মাসে মুক্তিযোদ্ধাগণ সামান্য হলেও ভাতা এবং সপ্তাহে ৫ প্যাকেট সিগারেট পাবেন।

প্রথমে পাঠান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পাইকপাড়া হাই স্কুলে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ভৌগোলিক ও কৌশলগত কারণে নোয়াখালীর রামগঞ্জের (বর্তমানে চাটখিলভুক্ত) পানিআলা গ্রামের ঠাকুর বাড়িতে এটি স্থানান্তর করা হয়। এখানেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত

হয়। এই গ্রামেই চলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা। ডা. বদরুন্নাহার চৌধুরী ও ডা. জয়নাল আবেদিন এই দায়িত্ব পালন করেন [২৭]।

পাঠান বাহিনীতে শুরুতে প্রায় ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এদেরকে এলাকাভিত্তিক ৫টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা হয়। এলাকাভিত্তিতে বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার ছিলেন:

১. নায়েক সুবেদার আলী আকবর পাটওয়ারী (রামগঞ্জ), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- হাজীগঞ্জ, রামগঞ্জ, চাটখিল, রায়পুর ও লাকসামের কিছু অংশ।

২. নায়েক সুবেদার জহুরুল ইসলাম (বরিশাল), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- মতলব থানা।

৩. সার্জেন্ট জয়নাল আবেদিন চৌধুরী (চাঁদপুর), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- চাঁদপুর ও হাইমচর।

৪. নায়েক সুবেদার আবদুর রব (ফরিদগঞ্জ), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- ফরিদগঞ্জ, রামগঞ্জের একাংশ ও রায়পুরের কিছু অংশ।

৫. হাবিলদার সিরাজুল ইসলাম (কচুয়া), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- কচুয়া থানা।

৬. নায়েব সুবেদার মফিজ (শাহরাস্তি), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- হেড কোয়ার্টার (প্রশিক্ষণ)।

ধীরে ধীরে পাঠান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৮৯৭ জনে পৌঁছায়। যুদ্ধের শেষ দিকে এ সংখ্যা আরো বাড়ে।[২৮] ফলে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনে কমান্ডের পরিবর্তন করা হয়েছিল।

পাঠান বাহিনীর একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। কেন্দ্রীয়ভাবে জহিরুল হক পাঠান এবং কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে গোয়েন্দা হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে।[২৯]

অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ

চাঁদপুরের বিভিন্ন থানা দখল করে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রই পাঠান বাহিনীর অস্ত্রের প্রধান উৎস ছিল। এ কাজে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন। তার পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে হাজীগঞ্জ থানা (দুই বার), মতলব থানা, কচুয়া থানা গেরিলা কৌশলে দখল করে প্রচুর রাইফেল, গোলাবারুদ এবং বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়।[৩০] এর বাইরে পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের আনা অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারে জমা করা হয়। এছাড়া যুদ্ধের ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের নিকট থেকে দখল করা অস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রের চাহিদা অনেকটা পূরণ করে।[৩১] ২নং সেক্টর

কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নিকট থেকেও অক্টোবর মাসের শেষ দিকে এই বাহিনী পঞ্চাশ হাজার গুলি ও কিছু গ্রেনেড পেয়েছিল।[৩২]

পাঠান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ব্যতীত এর নিকটবর্তী আরেকটি ঠাকুরবাড়িও মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৩৩] ওস্তাদ গফুর, ওস্তাদ ওয়াহাব, হাবিলদার আব্দুল মান্নান মতিন, মুহাম্মদ আলী, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল হকসহ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেশ কয়েকজন পেশাদার সৈনিক পাঠান বাহিনীর প্রশিক্ষক ছিলেন। এ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছিল ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী টোরাগড় বাজার, নরিংপুর বাজার, লোটরা বাজার, উগারিয়া বাজার, সোরসাগ বাজার, নোয়াপাড়া আপগ্রেড স্কুল মাঠ, বটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, হাসনাবাদ বাজার, আলী নকীপুর হাই স্কুল মাঠ, কাদরা প্রাইমারি স্কুল মাঠ, রামো প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, গৃদকালিন্দিয়া হাই স্কুল মাঠ, চররামপুর হাইস্কুল মাঠ, কালির বাজার, দক্ষিণ সাহেবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠসহ নিকটবর্তী বিভিন্ন থানার নানা স্থানে।[৩৪] পাঠান বাহিনীর প্রায় নব্বই ভাগ সদস্য সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তবুও স্থানীয় আনুমানিক তিনশ ছাত্র-যুবক বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।[৩৫]

আওতাভুক্ত এলাকা

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমা ও ডাকাতিয়া পাড়ের উল্লিখিত এলাকাসমূহে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় একমাত্র বাহিনী ছিল পাঠান বাহিনী। ২নং সেক্টরের সাবসেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুবের অধীন জুলাইয়ের পূর্বে এই এলাকায় কোনো কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণ নেই।[৩৬] এছাড়া বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাগণও সেপ্টেম্বরের পূর্বে চাঁদপুরে সক্রিয় ছিলেন না।[৩৭] আগস্ট মাসে চাঁদপুরে সক্রিয় ছিলেন শুধু নৌ কমান্ডোগণ।[৩৮]

পাঠান বাহিনীর যোদ্ধাগণ চাঁদপুরের মতলব, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাইমচর, সদর, নোয়াখালীর রামগঞ্জ, চাটখিল, রায়পুরের উত্তর-পূর্বাংশ, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, দাউদকান্দির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও লাকসাম এলাকায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[৩৯] তবে এ বাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র ছিল প্রধানত ডাকাতিয়া নদী সংলগ্ন শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, রামগঞ্জ, চাটখিল ও রায়পুরের উত্তর-পূর্বাংশ। মুক্তাঞ্চল না হলেও এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রায় এক হাজার বর্গমাইল এলাকা। যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত অন্যান্য দলের মুক্তিযোদ্ধাগণ বিভিন্ন স্থানে পাঠান বাহিনীর যোদ্ধাদের সহযোগিতা নিয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।[৪০]

উৎস: এ কে এম নাসিমুজ্জামান (সম্পা.), *মানচিত্রে পৃথিবী ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন্স, ২০২৩) গ্রন্থের (পৃ. ৭) অবলম্বনে বর্তমান মানচিত্রটি লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

(৩) রণনীতি, রণকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত শক্তির তুলনায় পাঠান বাহিনী অসম শক্তি ছিল। এটি অনুধাবন করে মুক্তিবাহিনীর সংগঠকবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা-জনতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে রণক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা আদায় করার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে পাঠান বাহিনীর সংগঠকগণ জনগণের ভেতর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা চালান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা কেন সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, কেন মুক্তিযুদ্ধ যুক্তিযুক্ত, ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা লোকালয়ে ও হাটে-বাজারে সভা করেছিলেন। এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জনসংযোগ কর্মসূচি চালিয়ে যান। যুদ্ধ শুরুর দিকে তিনি এ কাজে খুব একটা সাফল্য পাননি। এ অবস্থায় তিনি হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ এলাকার কুখ্যাত

কয়েকজন ডাকাত, লুটেরা ও দালালকে গণআদালতের মাধ্যমে চরম শাস্তি দেন। স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে শুরু করলে সাধারণ মানুষ পাঠান বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে শুরু করে। যুদ্ধকালে প্রধানত কলিমুল্লাহ ভূঁইয়ার প্রচেষ্টায় হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ থানায় এ বাহিনী কয়েকটা সভা করতে সক্ষম হয়। ফলে সাধারণ মানুষ এ বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়।[৪১] এর পর মুক্তিযোদ্ধাদের আর জনসমর্থন ও সহযোগিতার অভাব ঘটেনি। স্থানীয় মানুষের এই সমর্থন মুক্তিবাহিনীকে কৌশলগতভাবে যে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল, তা বলা বাহুল্য।

ডাকাতিয়া তীরবর্তী এলাকাসমূহে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠান বাহিনী গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। 'হিট অ্যান্ড রান' ছিল এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য। শত্রুর অস্ত্রেই শত্রুকে ঘায়েল করা ছিল বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।[৪২] শুরু থেকেই এই পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের যুদ্ধ করতে হবে গণচীন বা ভিয়েতনামের কায়দায়। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে এবং গেরিলা পদ্ধতিতে।"[৪৩] সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের সামরিক প্রজ্ঞা এবং কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার রণনীতি ও রণকৌশল এবং তার প্রত্যুৎপন্নমতিতার যৌথ রসায়নে পাঠান বাহিনী শত্রুকে নাস্তানাবুদ করতে চেষ্টা করে।

ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে চাঁদপুর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ স্থান ছিল। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও বরিশাল এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাক্যাম্পে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ থেকে শুরু করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সৈন্য সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য চাঁদপুরকে রিয়ার হেড কোয়ার্টার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৯তম ডিভিশনের সদর দপ্তর ছিল চাঁদপুর। ষোল হাজার নিয়মিত সৈন্যের বাইরে প্রায় পঁচিশ হাজার (পাকিস্তান রেঞ্জারস, আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্স, পাকিস্তান পুলিশ, রাজাকার-দালাল প্রভৃতি) সদস্য মিলে চাঁদপুর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল।[৪৪] পাকিস্তান নৌবাহিনীর কয়েকটি গানবোট সর্বক্ষণ ডাকাতিয়া নদীতে টহল দিত।[৪৫] এরূপ শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় থেকেও পাঠান বাহিনী শত্রুর বিপক্ষে ৬৪টি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[৪৬] এ বাহিনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাভিযানের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বলাখাল রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাট অভিযান[৪৭]

পাকিস্তানি সেনাদল লঞ্চে করে হাজীগঞ্জের রামচন্দ্রপুর নদীতে মাঝে মাঝেই টহল দিত এবং নৌপথে মুন্সির হাট পর্যন্ত যেত। এই টহল দলকে ব্যবহার করে পাকিস্তান বাহিনী রামচন্দ্রপুর নদীর পাড়ে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করছিল। তাদের এই আকস্মিক টহল ও ঘাঁটি স্থাপনে বাধা সৃষ্টির জন্য ১৭ মে ভোরবেলা বলাখাল রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাটে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, সুবেদার

আব্দুল হক, সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী, নায়েক বজলু, সিপাহী করিম, নায়েক সুবেদার নূর আহমদ গাজী, হাবিলদার গোলাম মাওলা, হাবিলদার আবদুর রশিদ, নায়েক মো. আলী, নায়েক সিদ্দিক, আবদুর রশিদ, নায়েক ফারুক, হাবিলদার আব্দুল মান্নান, হাবিলদার লোকমান, আহম্মদ উল্লাহ, রতন, আবু তাহের, শাহজাহান (২), গফুর, আবু বকর, শফিকুর রহমান, নিখিল চন্দ্র সাহা, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ এই অভিযানে অংশ নেন। এদের কাছে ৫টি এলএমজি, ২টি ২ ইঞ্চি মর্টার ও কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল ছিল।

হাজীগঞ্জ ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে প্রবহমান রামচন্দ্রপুর নদীর (ডাকাতিয়া নদীর স্থানীয় নাম) তীরে বলাখাল খেয়াঘাট অবস্থিত। এই ঘাটে পাকিস্তানি সৈন্যবাহী লঞ্চকে অ্যাম্বুশ করার জন্য সুবেদার জহিরুল হক পাঠান তিনটি ভাগে (নদীর পাড় ধরে) প্রায় আধা কি. মি. ব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। কলিমউল্লাহ ভূঁইয়াকে মাঝখানে রেখে বামে সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর দল ও ডানে সুবেদার পাঠান সৈন্যসহ অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্যবাহী দুটি লঞ্চ যখন কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার দলের বরাবর পৌঁছে যায়, তখন সুবেদার পাঠান লঞ্চ বরাবর গুলি ছোঁড়েন। এরপর অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও আক্রমণ চালান। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে শত্রুবাহিনীর কয়েকজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যবাহী একটি লঞ্চ মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে পিছিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্রান্ত সৈন্যদেরকে উদ্ধার করতে কয়েকটি ট্রাকে এসে বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বিপরীতমুখে রাস্তার ধারে ও অয়ারলেস বিল্ডিং এর ছাদে অবস্থান নেন। এ পর্যায়ে উভয়পক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলেছিল। অবশেষে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটে যায়। বলাখাল রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাটের যুদ্ধে ৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য আহত হন। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হাবিলদার লোকমান গুলিবিদ্ধ হন এবং কালু হাওলাদার নামের একজন সাধারণ মানুষ নিহত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদল পিছু হটায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় হয়েছিল বলা যায়।

নরিংপুর অভিযান[৪৮]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে নরিংপুর বাজারে পাকিস্তানি সেনাদল ক্যাম্প স্থাপন করে। এ ক্যাম্প থেকেই সেনারা আশপাশের গ্রামগুলোতে প্রায়শ অত্যাচার করতেন ও যুবতী নারী ধরে এনে ক্যাম্পে নির্যাতন করতেন। এই অপকর্মের জবাব দিতে মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ জুলাই ভোরবেলা নরিংপুর সেনা ক্যাম্পে অভিযান চালান। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, সুবেদার রব, সুবেদার আলী আকবর, হাবিলদার রশিদ, নায়েক ছিদ্দিক, হাবিলদার লোকমান, হাবিলদার মান্নান, আব্দুল মতিন পাটোয়ারী, বজলু, বোরহান চৌধুরী, হাফিজুর রহমান মন্টু, লতিফ, হাবিলদার বাশার, কাওসার, গোলাম রাব্বানী, আহাম্মদ উল্লাহ ভূঁইয়া, শাহ লতিফুর রহমান, নেছার পাটোয়ারী, শাহজাহান

(১), শাহজাহান (২), ফিরোজ, আলাউদ্দিন, জয়নাল চৌধুরী নয়ন, ল্যান্স নায়েক হানিফ, নায়েক মোহাম্মদ আলী, ডা. দেলোয়ার হোসেন খানসহ একশ দশজন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নরিংপুর অভিযানে অংশ নেন। এই অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ২টি এলএমজি, ১টি ২ ইঞ্চি মর্টার, ২টি স্টেনগান, বেশ কতকগুলো ৩০৩ রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল।

চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার সুচিপাড়া (দক্ষিণ) ইউনিয়নে নরিংপুর বাজার অবস্থিত। এখানে পাকা পরিখা তৈরি করে পাকিস্তানি সৈন্যদল একটি ক্যাম্প গড়ে তোলে যার ৭/৮ কি. মি. পূর্বে চিতসি বাজারে দখলদারদের আরেকটি ক্যাম্প ছিল। দুই ক্যাম্পের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জহিরুল হক পাঠান ও কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া টানা পাঁচদিন নরিংপুর সেনা ক্যাম্প ও আশপাশের এলাকা রেকি করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবেদার পাঠান ও কলিমউল্লাহর নেতৃত্বে একটি দল বাজারের কাছে, সুবেদার রবের নেতৃত্বে একটি দল ক্যাম্পের নিকটে এবং সুবেদার আলী আকবরের নেতৃত্বে আরেকটি দল ওগারিয়া বাজারের দক্ষিণের খালের পাড়ে অবস্থান নেন। ১৬ জুলাই ভোর ৪টার দিকে ওগারিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে সেতি নারায়ণপুর গ্রামের মোল্লা বাড়ির নিকটে টেলিফোনের তার কেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ভোরবেলা এই পথে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রায় ২২ জনের একটি দল টহল দিতে আসে। এই দল মোল্লা বাড়ির কাছে পৌঁছানো মাত্র সুবেদার আলী আকবর গুলি করা শুরু করেন। সেই সাথে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও গুলি করা শুরু করলে তাৎক্ষণিক আনুমানিক সাত/আট জন পাকিস্তানি সৈন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুই জন মারা যায়। দুই পক্ষে দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় চলে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে আক্রমণ করেছে জানতে পেরে কয়েকটি ট্রাকে করে তাদের আরো সৈন্য যুদ্ধস্থলে পৌঁছায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের মেশিনগান, এলএমজি, ৩ ইঞ্চি মর্টারের আক্রমণের জবাব দিতে দিতে মুক্তিযোদ্ধারা খেড়িহর ও বগৌড় গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে আসে। এদিকে নরিংপুর বাজার আক্রান্তের সংবাদে নরিংপুর সেনা ক্যাম্প ছেড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা চিতসির দিকে চলে যায়। নরিংপুর সেনা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এই ক্যাম্প থেকে ১৬ জন নারীকে উদ্ধার করা হয়। ক্যাম্প থেকে উদ্ধারকৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের লুট করা বেশ কিছু সামগ্রী প্রমাণ সাপেক্ষে জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, নরিংপুর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানি সেনাদল ওগারিয়া বাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গণহত্যা চালায় ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে তছনছ করে।

অফিস চিতসি অভিযান[৪৯]

শাহরাস্তি থানাভুক্ত অফিস চিতসি মুক্ত করতে পারলে দখলদার বাহিনীর নিকট থেকে লাকসাম, নোয়াখালী ও চাঁদপুরের বিরাট এলাকা মুক্ত হয়ে যাবে। এই ভাবনায় মুক্তিযোদ্ধারা ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল আনুমানিক ৭টায় অফিস চিতসি অভিযান চালানোর

সিদ্ধান্ত নেন। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, নায়েক সুবেদার রব, ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন খান, নায়েক এরশাদ, হাবিলদার গোলাম মাওলা, বজলু ওস্তাদ, হাবিলদার সিরাজ, হাবিলদার মতিন, বোরহান চৌধুরী, নেছার আহম্মদ, আলা উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ, আহাম্মদ উল্লাহ ভূঁইয়া, হেদায়েত উল্লাহ প্রমুখ অভিযানে অংশ নেন। এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, স্টেনগান, চায়নিজ রাইফেল, ব্রিটিশ এলএমজি, ৩০৩ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অফিস চিতসি অভিযানে অংশ নেন।

অফিস চিতসি চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার অন্তর্গত যার পূর্বে লাকসাম ও দক্ষিণে নোয়াখালীর চাটখিল অবস্থিত। চিতসি বাজার সংলগ্ন স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদলের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল যেখানে তাদের সাথে অনেক রাজাকার থাকতেন। এই অবস্থানে আঘাত হানার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবেদার পাঠান সুবেদার রব ও কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একদল যোদ্ধাকে পাকিস্তানি ঘাঁটির দক্ষিণে কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। আর এক দল মুক্তিযোদ্ধা দুটি এলএমজি নিয়ে চান্দাইল নাগেশ্বর দিঘির পারে অবস্থান নেন। এরপর সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে এক দল মুক্তিযোদ্ধাকে সুচিপাড়ায় রেখে বাকি সবাইকে অফিস চিতসি চলে আসার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতো মুক্তিযোদ্ধারা সেনা ক্যাম্প ঘিরে অবস্থান নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রস্তুতি লক্ষ করে চিতসি ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদেরকে ঘাঁটিতে রেখে সকাল বেলায় উত্তর দিকে রেল স্টেশনের দিকে চলে যায়। সকাল ৭ টার দিকে রাজাকাররা প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আঘাত হানে। প্রত্যুত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা এলএমজি ও চায়নিজ রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে জবাব দিতে থাকেন। থেমে থেমে উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় চলতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিন তিনজন রাজাকার তাদের রাইফেল ও প্রচুর গুলিসহ আত্মসমর্পণ করেন। এদিন রাতে পালাবার সময় সাত/আটজন রাজাকার চিতসির পাশের গ্রামের জনতার হাতে ধরা পড়েন। এদেরকে জনতা ধোলাই দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখেন। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুক্যাম্প দুইদিন ঘেরাও করে রাখে। এসময়ে রাজাকার দল পাকিস্তানি সৈন্য বা অন্য কোনো সহায়তা পায়নি। ফলে তাদের যুদ্ধরসদ প্রায় শেষের দিকে ছিল। ২য় দিন গভীর রাতে রাজাকাররা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধস্থান ও নিকটবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ জীবনের শঙ্কা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার, ডাবের পানি, পিঠা, কাঁথা-কাপড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দিয়েছিল। অবশেষে অফিস চিতসি সেনা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে এবং সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্প থেকে বারজন হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য এ বাহিনীর ডাক্তার বদরুন্নাহারের তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়। এখানেও ক্যাম্প থেকে উদ্ধারকৃত সামগ্রী জনগণের মাঝে প্রমাণ সাপেক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ও দান করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প থেকে দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টার, দুটি চায়নিজ এলএমজি, বিশটি চায়নিজ রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ হস্তগত করেন।

সুচিপাড়া অভিযান[৫০]

১ অক্টোবর মুক্তিবাহিনী দখলদার বাহিনীর অফিস চিতসি ক্যাম্প দখল করে নেয় এবং এর ফলে ফরিদগঞ্জের একটি বড় অংশ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। গোয়েন্দাদের থেকে কমান্ডার সুবেদার পাঠান খবর পান যে, পাকিস্তানি সৈন্যদল পুনরায় তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ফরিদগঞ্জের মুক্ত এলাকা দখল করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই আক্রমণ প্রতিহত করে মুক্তাঞ্চল ধরে রাখার জন্য শাহরাস্তির সুচিপাড়ার দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, হাবিলদার মোহাম্মদ আলী, হাবিলদার নূরুল ইসলাম, আসলাম মোল্লা, সৈয়দ আহম্মদ, ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন খান, আব্দুল লতিফ ভূঁইয়াসহ প্রায় দুই সেকশন মুক্তিযোদ্ধা তিনটি এলএমজি, ১৯টি চায়নিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে দ্বিতীয় দফা সুচিপাড়ার অভিযানে অংশ নেন।

সুচিপাড়ার ডাকাতিয়া নদীর খেয়াঘাটে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন সকালে পাকিস্তানি সৈন্যদলের সাথে পাঠান বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এদিন শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য খেয়াঘাটের উত্তর দিক হতে নদীর অপর পাড়ে মুক্তাঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে। এই খবরে সুবেদার পাঠান সুবেদার মোহাম্মদ আলী ও সুবেদার নূরুল ইসলামের সেকশন দুটিকে খেয়াঘাট থেকে ছয়শ গজ দূরে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অপর পক্ষ খেয়াঘাট পার হয়ে ডিফেন্স নেওয়ার পূর্বেই তাদেরকে নিঃশেষ করে দিতে হবে। সেই অনুযায়ী আনুমানিক আশিজন পাকিস্তানি সৈন্য ঘাট পার হয়ে পাড়ে অবস্থান নেওয়ার পূর্বেই সুবেদার মোহাম্মদ আলী ও নূরুল ইসলামের মুক্তিযোদ্ধা দল এলএমজি ও চায়নিজ রাইফেল থেকে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। অবস্থানগত দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা নদীর উঁচু পাড়ে কিছুটা আবডালে ও সুবিধানজক পজিশনে ছিল। অন্যদিকে খেয়া পার হয়ে আসা সৈন্যরা নদীর নিচু তীরে অবস্থান নেয় এবং তাদের উত্তরে ছিল নদী। তারা নদীর অপর পাড়ে থাকা সৈন্য ও রসদের কোনো সরবরাহ পাওয়ার অবস্থায় ছিলেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রতিউত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যরা ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা ছুঁড়তে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পূর্ব-উত্তর দিকও নদীঘেরা থাকায় এ পথেও দখলদার বাহিনী প্রবেশ করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে নোয়াপাড়ায় এক সেকশন মুক্তিযোদ্ধা রেখে কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ব-উত্তর ও দক্ষিণের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করেন। অপরদিকে মুক্তাঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদল সারাদিন মর্টারের গোলাসহ মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকেন। অবশেষে রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদল তাদের নিহত ও আহত সৈন্যদের একাংশকে তুলে নিয়ে অবস্থান ত্যাগ করেন। সুচিপাড়া খেয়াঘাটের যুদ্ধে ছত্রিশজন পাকিস্তানি সেনার লাশ পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। মুক্তাঞ্চল যাতে ধরে রাখা যায় সেজন্য কমান্ডার সুচিপাড়ার আশেপাশে ডিফেন্স প্রস্তুত রাখেন।

গাজীপুর অভিযান[৫১]

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনাদলের ফরিদগঞ্জ ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে অবরোধ করে রাখে। এই ক্যাম্পে যাতে যুদ্ধ রসদ ও খাদ্য সামগ্রী না পৌঁছে সে বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধাগণ তৎপর ছিলেন। এর মধ্যে খবর আসে যে, খাদ্য ও রসদবাহী একটি কার্গো লঞ্চ চাঁদপুর হতে চান্দ্রাবাজার ও টুবগী হয়ে গাজীপুরের ভেতর দিয়ে ফরিদগঞ্জ ক্যাম্পে যাবে। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান কার্গো লঞ্চটি অ্যাম্বুশ করার পরিকল্পনা করেন। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, সুবেদার রব, সুবেদার আবদুল হক, আলী হোসেন ভূঁইয়া, মাহবুবুর রহমান, খাজা আহমদ, ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন খান, আমজাদ হোসেন পাটোয়ারী, আলম বস, রুহুল আমিন, আনোয়ার হোসেন, মো. শফিকউল্লাহসহ প্রমুখ অভিযানের প্রস্তুতি নেন। এই অভিযানে এফএফ ও বিএলএফ এর দুটি দলও অংশ নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সাতটি এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, প্রচুর এসএলআর ও রাইফেল এবং হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল।

গাজীপুর ফরিদগঞ্জ থানার উত্তরে অবস্থিত ও চাঁদপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ডাকাতিয়া নদী চাঁদপুর হতে ফরিদগঞ্জে গেছে গাজীপুরের ভেতর দিয়ে। গাজীপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের কার্গো অ্যাম্বুশ করার জন্য সুবেদার পাঠান এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটি সেকশনকে ফরিদগঞ্জের কাছে রূপসা রাস্তার ওপর, একটি সেকশন কেবরার চর ও একটি সেকশন গাজীপুরে রাখেন। কেবরার চর ও গাজীপুরে সেকশন কমান্ডার হিসেবে ছিলেন সুবেদার আব্দুল হক ও সুবেদার রব এবং ফরিদগঞ্জের দক্ষিণে বিএলএফ ও পশ্চিমে এফএফ যোদ্ধাগণ অবস্থান নিয়েছিলেন। পাঠান সাহেবের নির্দেশনা মোতাবেক সুবেদার হকের গ্রুপ গাজীপুরের শহীদ মেম্বারের বাড়ি হতে বাজারের বামপাশ পর্যন্ত প্রস্তুত থাকেন। অপরদিকে গাজীপুরের ঈদগাহ হতে শেখের দোন পর্যন্ত প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন এফএফ মুক্তিযোদ্ধারা। কমান্ডারের নির্দেশ ছিল যে, কার্গোটি যখন গাজীপুরের কাছাকাছি আসবে তখন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝখানের অবস্থান থেকে আক্রমণ শুরু হবে। ১৭ নভেম্বর দুপুর নাগাদ রসদবাহী কার্গোটি দ্রুততার সাথে রাজাপুর পর্যন্ত আসে এবং গতি কমিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে আবার গতি বাড়িয়ে ফরিদগঞ্জের দিকে যেতে থাকে। কার্গোটি মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জের ভেতর মুক্তি অবস্থানের মাঝামাঝি পৌঁছালে সেকশন কমান্ডার হক গুলি করার নির্দেশ দেন। তিন দিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কার্গো লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন। এই আচমকা গুলিবর্ষণে কার্গোর চালকসহ অনেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে ও অনেকে আহত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছুটা সামলে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা ও এলএমজি দিয়ে গুলি চালাতে থাকেন। মর্টারের গোলায় এফএফ যোদ্ধা মাহবুবুর রহমান পায়ে আঘাত পান। উভয়পক্ষের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলে। এক পর্যায়ে দখলদার সৈন্যরা কার্গো ছেড়ে নদী সাঁতরিয়ে অপর পারে ওঠেন এবং যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে ফরিদগঞ্জের দিকে পালিয়ে যান। কার্গো লঞ্চটি

মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এই যুদ্ধের পর ফরিদগঞ্জে আর কখনো পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার দল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে জড়ায়নি।

উল্লিখিত অভিযানগুলো ছাড়াও পাঠান বাহিনী ফরিদগঞ্জ, খাজুরিয়া, কড়াইতলী, গাজীপুর, চান্দ্রা, নানুপুর, ইছলি, নরিংপুর, পানিআলা, উটতলী, মুন্সীরহাট, শোল্লা বলাখাল, রাগৈবাঁকিলা, খোদাই বিল, সুচিপাড়া, খেতের পাড়, ঠাকুর বাজার, আয়নাতলী, লাউকোরা, রামগঞ্জ, মুদাফ্ফরগঞ্জ, রঘুনাথপুর, বৈশেরহাট, গোবিন্দপুর, মুকুন্দসার, ভাটিরগাঁও, বাঁসারা, শাসিয়ালী, পাইকপাড়া, খিলী, চৌমুহনী, চিতলী, লাঙ্গলকোট, হাসনাবাদ, রূপসী, বিঘা, পালিকারা, মেহের কালিবাড়ি, চৌধুরী বাজার প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার-দালালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

উপসংহার

পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে বাঙালি জাতি দখলদার বাহিনীর এরূপ কর্মকাণ্ডকে তার নিজের অস্তিত্বের জন্য চূড়ান্ত হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে। ঢাকাসহ সারাদেশে শুরু হওয়া এই গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় দেশের অন্যান্য স্থানের মতো চাঁদপুর মহকুমায় সর্বোচ্চ সমষ্টিগত প্রতিরোধ সশস্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রতিরোধী মানসিকতা থেকেই মুক্তিযুদ্ধকালে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী হাজীগঞ্জকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে ওঠে। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সহাযোগিতায় এই মুক্তিযোদ্ধা দল পরিচালনা করেন এপ্রিলের শেষ ভাগ হতে। এই দল স্থানীয় মানুষের কাছে 'পাঠান বাহিনী' নামে সুপরিচিত হয়েছিল। এই বাহিনী যুদ্ধের পুরো সময়ে চাঁদপুর মহকুমা ও এর দক্ষিণাংশে মুক্তিযুদ্ধকে চলমান রেখেছিল। তারা স্থানীয় সমাজবিরোধী চোর-ডাকাত-লুটেরা-দালাল-রাজাকারদেরকে মোকাবেলা করার সাথে সাথে অত্যন্ত শক্তিশালী (সমরাস্ত্রে ও সৈন্য সংখ্যায়) পাকিস্তানি সৈন্যদলকে মোকাবেলা করেছিল। চাঁদপুর শহর পাকিস্তানি সেনাদলের দখলে চলে যাবার পর থেকে হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ এলাকায় অবস্থান করে পাঠান বাহিনী পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদেরকে মোকাবেলা করেছিল। পাঠান বাহিনীর অভিযান ২০ এপ্রিল (ফরিগঞ্জের খাদ্য গুদাম অভিযান) শুরু হয় এবং তা চাঁদপুর মহকুমা মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। ১৯৭১ সালে চাঁদপুর মহকুমায় পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের আনুমানিক ৭৪টি যুদ্ধ/সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল।[৫২] এর মধ্যে শুধু পাঠান বাহিনীর সাথে অপর পক্ষের প্রায় ৬৪টি যুদ্ধ/সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল। বর্তমান গবেষণায় স্পষ্ট যে, এসব যুদ্ধে পাকিস্তানিদের প্রচুর সৈন্য ও রসদহানি ঘটে। সেই তুলনায় পাঠান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেক কম।

পাঠান বাহিনীর সামরিক নীতিতে গণতান্ত্রিকতা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সামরিক নেতৃবৃন্দ সর্বাবস্থায় নীতি প্রণয়নে পারস্পরিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করেছিলেন।

এই বিষয়টি মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের সূত্র হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাশাপাশি পাঠান বাহিনীর বেসামরিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের নৈতিক মান অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। স্থানীয় পর্যায়ে তারা পরিচিত মুখ বিধায়, সাধারণ মানুষ ও বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দের মধ্যে নেতাদের নৈতিকতা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা স্বাভাবিক। গবেষণাকালে আলোচ্য বাহিনীর নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে চরিত্রহীনতা ও নীতিহীনতার কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বরং নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে যুদ্ধশেষে উদ্ধার করা মালামাল স্থানীয়দের, বিশেষ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা, সম্মানহানির শিকার হওয়া নারীদেরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা, অভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের সম্পদ ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করা, প্রভৃতি উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি ইতিবাচক ধারণা বজায় ছিল। অপরদিকে, আলোচ্য এলাকাসমূহে নিয়োজিত পাকিস্তানি সেনানেতৃত্ব ও তাদের সহযোগী শক্তি স্থানীয় জনগণের কাছে কীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল তা সুবিদিত। যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় অবশ্যই এই বিষয়টি জনমনে প্রভাব ফেলে থাকবে।

পাঠান বাহিনীর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল অবরুদ্ধ চাঁদপুরেই নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আনুমানিক তিনশত প্রশিক্ষিত যোদ্ধা তৈরি। পাশাপাশি অসংখ্য যুবক এই বাহিনীর সহায়তায় ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পান। পাঠান বাহিনীর সক্রিয়তায় ডাকাতিয়া তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জনগণের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়েছিলেন এবং এর ফলস্বরূপ তারা স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পেতে সক্ষম হয়েছিল। জনসমর্থনের কারণে চাঁদপুরের মুক্তিযুদ্ধ যেন রূপান্তরিত হয়েছিল জনযুদ্ধে। কমরেড মাও সে-তুঙের প্রস্তাবিত গেরিলা যুদ্ধ নীতি ও বৈশিষ্ট্যের যেন বঙ্গীয় বদ্বীপের স্থানিক রূপ। সমাজতন্ত্রী স্থানীয় ন্যাপ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ও সামরিক জ্ঞান ডাকাতিয়া পাড়ের জল-জমিনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণে সহায়তা ও সাফল্য এনে দিয়েছিল।

পাঠান বাহিনী পাকিস্তান সেনাদল ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে প্রধানত গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। শুধু 'হিট অ্যান্ড রান' গেরিলা যুদ্ধকৌশল নয়, জনবেষ্টনী ও স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এই দল শত্রুপক্ষের বিপক্ষে উদ্ভাবনী নানা যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করেছিল। বাহিনীর সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর রণকৌশলে কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। অক্টোবরের শেষাংশ থেকে এ বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদলের বিপক্ষে সম্মুখ যুদ্ধেও লিপ্ত হতে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাঠান বাহিনী যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যেসব খণ্ডযুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল, সেগুলো সংঘটিত হয় গ্রামাঞ্চলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শত্রুপক্ষের মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের ছোটো ছোটো টহল দলকে এই বাহিনী নিজেদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে, তথা গ্রামের রাস্তায় বা গ্রামীণ বাজারে অথবা নদীর পাড়ে আক্রমণ

করেছে। অথবা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে 'স্ট্রাটেজিক কাউন্টার অফেনসিভ' ধারায় এ বাহিনী শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করেছে। এবং প্রথম দিকে পাঠান বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ শত্রুকে পরাস্ত করার চেয়ে তাদের মনোবল ভাঙতে চেষ্টা করেছে বেশি। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বাহিনীর সামরিক নেতৃবৃন্দ শত্রুপক্ষকে সর্বদা একই এলাকায় আক্রমণ না করে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করেছে বা প্রতিরোধ করেছে। এর মাধ্যমে পাঠান বাহিনী পাকিস্তানি সেনাসদস্যদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি করতে চেষ্টা করেছে যে, মুক্তিবাহিনী সর্বক্ষণ সব জায়গায় অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। ডাকাতিয়া পাড়ের মুক্তিবাহিনীর এই রণকৌশলকে মাও এর 'মোবাইল ওয়ারফেয়ার' ধারণার সাথে প্রায় হুবহু মিলে যেতে দেখা যায়।

পাঠান বাহিনী যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসে (সেপ্টেম্বরের শেষদিক হতে শুরু) যুদ্ধক্ষেত্র গ্রাম-অভ্যন্তর থেকে বের করে এনে খানিকটা গঞ্জ বা স্থানীয় ছোটো শহর এলাকায় ছড়িয়ে দেয় বলে প্রতীয়মান হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রায়শ পাঠান বাহিনীর কাছে শত্রুবাহিনীর পরাস্ত হওয়ার ফলে এসব এলাকায় শত্রুসেনার প্রায় অনুপস্থিতি, যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অর্জিত সামরিক অভিজ্ঞতা এবং ইতোমধ্যেই পাঠান বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারে কার্যকর অস্ত্র যুক্ত হওয়া সম্ভবত এর কারণ। এই পর্যায়ে শত্রুপক্ষের অস্থায়ী ও স্থায়ী অবস্থানে পাঠান বাহিনীকে সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা করতে দেখা যায়। গেরিলা যুদ্ধকৌশলে মাও সে-তুঙ এর সংযোজন 'স্ট্রাটেজিক কাউন্টার অফেনসিভ' ধারণার সাথে পাঠান বাহিনীর যুদ্ধনীতির মিল লক্ষণীয়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড (ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪), ৫৪৮-৬৩১।

২. Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (New Jersey: Princeton University Press, 1970) ; উদ্ধৃত, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০), ১৪।

৩. Ian F. W. Beckett, *Encyclopedia of Guerrilla Warfare* (New York: Checkmark Books, 2001), xi.

৪. Carl von Clausewitz, *On War, Volume I* trans. J. J. Graham (London: Routledge and Kegan Paul, 1968), 11.

৫. *Selected Works of Mao Tse-Tung, Volume III* (Peking: Foreign Languages Press, 1967), 259.

৬. *Ibid*, 228.

৭. Sun Tzu, *The Art of War* trans. Samuel B. Griffith (London: Duncan Baird Publishers, 2005), 92.

৮. *Military Writings*, 103-147.

৯. Gareth Porter, ed., *Vietnam A History in Documents* (New York: A Meridian Book, New American Library, 1981), 114-15.

১০. আবু হানিফ শেখ, *বাংলাদেশের নদ-নদী ও নদী তীরবর্তী জনপদ* (ঢাকাঃ অবসর, ২০১৬), ২৩৮।

১১. যেহেতু উল্লিখিত স্থানসমূহ একাধিক জেলা বা মহকুমাভুক্ত তাই এ স্থানসমূহকে একক কোনো প্রশাসনিক সীমানার অধীন পরিচিতকরণ সম্ভব নয়। এসব স্থান একত্রে কোনো বিশেষ 'অঞ্চল' নামে (যেমনঃ চলন বিল এলাকা) স্থানিক বা দেশীয় পরিসরে পরিচিত না হওয়ায় সহজে চিহ্নিতকরণের স্বার্থে 'ডাকাতিয়া তীরবর্তী' বা 'ডাকাতিয়া পাড়'ভুক্ত এলাকা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া, সম্পা., *'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর* (ঢাকাঃ চাঁদপুর মুক্তিফৌজ ফাউন্ডেশন, ২০১০), ৫।

১৩. ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, ১৩/৫ আওরঙ্গজেব রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১১টা।

১৪. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ১৩।

১৫. এ এস এম সামছুল আরেফিন, সংকলন ও সম্পা., *বাংলাদেশের নির্বাচন* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩), ৬৩, ৭৩।

১৬. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ১৩।

১৭. দেলোয়ার হোসেন খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর* (ঢাকাঃ প্রকাশকঃ বেগম সামছুন্নাহার খানম, ২০০২), ২৯-৩৩।

১৮. *প্রাগুক্ত*, ৩৩; ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ২১।

১৯. গোলাম রাব্বানী, পিতাঃ ছেরাজ উদ্দিন আহমেদ, ১৭/১৭, মিশন রোড, চাঁদপুর সদর (৩৬০০), চাঁদপুর, লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, শাহবাগ, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০১৭, বিকাল ৫টা।

২০. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৬।

২১. জহিরুল হক পাঠান, লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, নার্গিস ভিলা, ৫৯ রজ্জব আলী সরদার রোড, পূর্ব জুড়াইন, কদমতলী, ঢাকা, ৭ জুলাই ২০১৭, বিকাল ৪.৩০ মি.।

২২. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ১৫।

২৩. খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৩৩-৩৪।

২৪. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৭।

২৫. *প্রাগুক্ত*, ২৬।

২৬. জহিরুল হক পাঠান, সাক্ষাৎকার।

২৭. খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৩৬।

২৮. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৭।

২৯. শাহ আলম, পিতা: মো. আব্দুল হাই, লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২২/৬, ঢাকেশ্বরী রোড, পলাশী, লালবাগ, ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫, বিকাল ৪টা।

৩০. জহিরুল হক পাঠান, সাক্ষাৎকার।

৩১. ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, সাক্ষাৎকার; খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৮৬-২১৫।- এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাহিনীর অস্ত্র সংগ্রহের বর্ণনা দেখুন।

৩২. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ১২।

৩৩. খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৩৬।

৩৪. *প্রাগুক্ত*, ৩২-৩৩।

৩৫. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ১২।

৩৬. শাহজাহান কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ২০১৮), ৩২৬।

৩৭. গোলাম রাব্বানী, সাক্ষাৎকার।

৩৮. খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ২২৯।

৩৯. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ৩-৫।

৪০. কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ১৯৭।

৪১. গোলাম রাব্বানী, সাক্ষাৎকার।

৪২. জহিরুল হক পাঠান, সাক্ষাৎকার।

৪৩. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ২৯।

৪৪. কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ৫৫।

৪৫. শাহজাহান কবির, *চাঁদপুরে নৌ-মুক্তিযুদ্ধ*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২), ৩৭।

৪৬. কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ৩০১।

৪৭. কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ১৩১-৩৪; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, (ঢাকা: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ২০০৮), ৭৩৫-৩৬।

৪৮. *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ৭৪০-৪১; কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ১৫৩-১৫৯।

৪৯. খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ১৪৪-৪৮; কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ১৬১-৬৪।

৫০. *প্রাগুক্ত*, ১৫৬; *প্রাগুক্ত*, ১৬৪-৬৭।

৫১. *প্রাগুক্ত*, ১৫৭-৫৯; *প্রাগুক্ত*, ১১১-১১৪।

৫২. ভূঁইয়া, সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*; খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*; কবির, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *দ্বিতীয় খণ্ড* অবলম্বনে চাঁদপুরে সংঘটিত যুদ্ধের মোট সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হয়েছে।